হিমালয়কেন্দ্রিক ৫৫২ বাঁধ হচ্ছে

হেলালউদ্দিন/সাজ্জাদ আলম খান

ভারত, পাকিস্তান, ভুটান, নেপাল– এ চারটি দেশের বিদ্যুৎ চাহিদা মেটাতে মহামরুকরণ এবং পরিবেশ বিপর্যয়ের মুখে এখন বাংলাদেশ। জলবিদ্যুৎ উৎপাদনে এদেশের উজানে হিমালয়কেন্দ্রিক ৫৫২টি বাঁধ নির্মিত হচ্ছে। ২ লাখ ১২ হাজার ২৭০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন করার এ মহাপরিকল্পনায় বাংলাদেশের কোন সম্পৃক্ততা নেই। এ চারটি দেশ পানিবিদ্যুৎ উৎপাদনের লক্ষ্যে হিমালয় পর্বতশ্রেণী থেকে উৎপন্ন নদীগুলোতে পরিকল্পিতভাবে ছোট-বড় এসব ড্যাম (বাঁধ) নির্মাণ শুরু করেছে। এ কাজে নেতৃত্ব দিচ্ছে ভারত। বছরের পর বছর এসব নিয়ে তারা ধীরে ধীরে কাজ শুরু করলেও বর্তমানে তা 'মহাযজ্ঞে' রূপ নিয়েছে। এক্ষেত্রে বাংলাদেশের স্বার্থ মারাত্মকভাবে উপেক্ষিত হওয়ার আশংকা রয়েছে। দ্বিপাক্ষিক ও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন চুক্তি, সমঝোতা, সনদ ও স্মারক অনুযায়ী অভিন্ন নদীগুলোকে কেন্দ্র করে যে কোন প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে বাংলাদেশের সঙ্গে তথ্যের আদান-প্রদানের যে শর্ত রয়েছে, জলবিদ্যুৎ প্রকল্প পরিকল্পনায় সেটা উপেক্ষা করা হচ্ছে বলে স্বীকার করেছে সংশিষ্ট একাধিক দায়িত্বশীল সূত্র। দেশের পানি, জলবায়ু এবং পরিবেশ বিশেষজ্ঞরা উদ্বেগ প্রকাশ করে বলেছেন, এসব ড্যাম নির্মাণে পরিবেশ ও প্রতিবেশ হবে বিকলাঙ্গ। সবচেয়ে বড় বিপদ নদীর প্রবাহ কমে গেলে বঙ্গোপসাগরের লবণাক্ততা মূল ভূখণ্ডের অনেক ভেতরে চলে আসবে। এর ফলে ধ্বংস হয়ে যাবে 'বাংলাদেশের ঢাল' সুন্দরবন, ফসল জন্মানো কঠিন হয়ে যাবে, সেতু-ভবনসহ গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনাগুলোতে মরিচা ধরবে। বাংলাদেশের নদীগুলো শুকিয়ে যাবে। নদীবাহিত পলিতে, পানিশূন্যতায় ভরাট হয়ে যাবে নদীগুলো। পানিতে বাড়বে লবণ। এতে এক মহামরুকরণের সর্বনাশে পতিত হবে বাংলাদেশ। অনিশ্চয়তা আর হুমকির মুখে পড়বে দেশের কৃষি ও খাদ্য উৎপাদন। প্রায় রুদ্ধ হয়ে যাবে পানিসম্পদের বিকাশ। একাধিক আন্তর্জাতিক গবেষণা রিপোর্ট পর্যালোচনা করে জানা গেছে, ভারত, পাকিস্তান, ভুটান, নেপাল মূলত চারটি দেশ হিমালয় পর্বতশ্রেণী থেকে উৎপন্ন নদীগুলোর সুযোগকে কাজে লাগিয়ে

পানিবিদ্যুৎ উৎপাদনের কাজে নেমেছে। এজন্য নেয়া হয়েছে স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা। প্রকল্পটি বাস্ত বায়নে চারটি দেশ প্রাথমিকভাবে প্রায় ৯৬ বিলিয়ন ডলারের ব্যয়ের প্রাক্কলন করেছে। এডিবি, বিশ্বব্যাংকসহ ভারতীয় অর্থলগ্নিকারী প্রতিষ্ঠানগুলোকে ব্যবহার করে, বেসরকারি বিনিয়োগকারীদের উৎসাহিত করে নেপাল ও ভুটানকে আর্থিক সহায়তা দিয়ে ভারত পানিবিদ্যুৎ উৎপাদন প্রকল্প বাস্তবায়নকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিচ্ছে। জানা গেছে, হিমালয় পর্বতশ্রেণীবাহিত নদীগুলোর প্রবাহ ভুটান, নেপাল, ভারত হয়ে নেমে এসেছে বাংলাদেশে। পদ্মা, ব্রহ্মপুত্র বাংলাদেশের দুই বড় নদীর আদি উৎপত্তি উত্তর ভারতের বিস্তীর্ণ হিমালয় পর্বতমালায়। মেঘনার উৎপত্তি ভারতের বরাক নদী। বাংলাদেশের ৫৪টি নদীর উৎপত্তি ভারতে। ৩টি নদীর উৎপত্তি মিয়ানমারে। এখন চার দেশের উদ্যোগে এসব নদীর মুখে অসংখ্য বাঁধ (ড্যাম) নির্মাণ করে বিদ্যুৎ উৎপাদন করার জোর প্রচেষ্টা চলছে। এক্ষেত্রে বাংলাদেশের স্বার্থ মারাত্মকভাবে উপেক্ষিত হওয়ার আশংকা রয়েছে। গঙ্গার পানি বণ্টন চুক্তিতে অভিন্ন নদীগুলোর 'সর্বোচ্চ ব্যবহারে যৌথ উদ্যোগ' এবং পরস্পরের অধিকার ক্ষুণ্ন না করার যে অঙ্গীকার করা হয়েছে, হিমালয় অঞ্চলের প্রকল্পগুলো বাস্তবায়নে তা রক্ষা করা সম্ভব হবে না বলে মনে করা হচ্ছে। যদিও পানিবিদ্যুৎ প্রকল্পগুলোর নির্মাতা ৩টি দক্ষিণ এশীয় দেশও নানা মাত্রায় ক্ষতিগ্রস্ত হবে; কিন্তু আশংকা করা হচ্ছে বাংলাদেশের ক্ষতি হবে সবচেয়ে বেশি। সূত্র মতে, বাংলাদেশের বড় বেকায়দা হচ্ছে, একটি ছাড়া এদেশে প্রবাহিত আন্তর্জাতিক ৫৭টি নদীর সব ক'টির উৎস হচ্ছে সীমানার বাইরে। এসব নদীর পানি বণ্টনের ক্ষেত্রে ভাটির এদেশের চুক্তি, সমঝোতা ও আন্তর্জাতিক কনভেনশনের ওপর ভরসা করা ছাড়া উপায় নেই। অভিন্ন নদীগুলোতে বাঁধ বা অন্যান্য স্থাপনা নির্মাণের বিষয় সাধারণত এ ধরনের আইন দিয়েই নিয়ন্ত্রিত হয়। এক্ষেত্রে সুবিধা হয় চুক্তিটি বহুপাক্ষিক হলে। কিন্তু বাংলাদেশের দুর্ভাগ্য হচ্ছে, উপমহাদেশে অভিন্ন নদীগুলোর পানি বণ্টন নিয়ে এ পর্যন্ত করা সব চুক্তি দ্বিপাক্ষিক। ব্রহ্মপুত্র, গঙ্গা বা সিন্ধুর মতো নদী তিন-চারটি দেশের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হলেও পানি বণ্টন চুক্তি হয়েছে দু'পক্ষের মধ্যে। এছাড়া ৫৪টি ট্রান্সবাউন্ডারি নদী, যার উৎসভূমি ভারতে (হিমালয় পর্বতশ্রণীসহ অন্যান্য জায়গা) তার মধ্যে শুধু একটি নদী 'গঙ্গা'র বিষয়ে ভারতের সঙ্গে আমাদের একটি চুক্তি আছে। এজন্য বাংলাদেশ আন্তর্জাতিকভাবে দুর্বল অবস্থানে আছে বলে জানা গেছে। সংশিষ্টরা দাবি করছেন, ভারতই মূলত ত্রিপাক্ষিক বা বহুপাক্ষিক চুক্তিতে রাজি থাকে না। দেশটি মনে করে এতে করে প্রধান প্রধান নদীতে চীনকে সঙ্গে নিতে হবে। সেক্ষেত্রে ভারতের প্রভাব ক্ষুণ্ন হতে পারে। সংশিষ্ট সূত্র মতে, বাংলাদেশের আরেকটি বড় বেকায়দা হচ্ছে ১৯৯৭ সালে জাতিসংঘ ওয়াটারকোর্স কনভেনশন এখনও কার্যকর না হওয়া। এ কনভেনশনে বহু দেশ স্বাক্ষর করলেও বাংলাদেশ এখনও এতে অনুস্বাক্ষর করেনি। এতে বৃহৎ পক্ষগুলোর ঔদাসীন্য রয়েছে বলে জানা গেছে। বাংলাদেশ জাতিসংঘ অধিবেশনে এ সনদ পাসের পক্ষে ভোট দিলেও এখন পর্যন্ত সংসদে রেটিফাই করেনি। 'আন্তর্জাতিক ল' কমিশনের মাধ্যমে প্রণীত কনভেনশনকে বলা হয় এভিডেন্স অব কাস্টমারি ল' বা প্রথাগত আইন। এর বলে বাংলাদেশ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ফোরামে তার অধিকারের কথা তুলে ধরতে পারত। একই সঙ্গে ভারতের বিরুদ্ধে কনভেনশন লঙ্ঘনের অভিযোগও আনতে পারত। কিন্তু অজ্ঞাত কারণে এ বিষয়টিকে গুরুত্ব দেয়া হচ্ছে না। যে কারণে আন্তর্জাতিক আইনে বাংলাদেশ কোন প্রতিকার পেতে পারছে না। সূত্র মতে, ভারতে বিদ্যুতের বিপুল ঘাটতি যেমন আছে, তেমনি আছে নতুন বিদ্যুৎ চাহিদা। কয়েক বছর ধরে ৯ শতাংশের ওপরে বার্ষিক প্রবৃদ্ধি করায় ভারতের শিল্পায়ন বাড়ছে। দ্রুতগতিতে বাড়ছে বিদ্যুতের চাহিদাও। এজন্য ভারত তার নিজের দেশেই নয়, ভুটান, নেপালের বিদ্যুৎ বিশেষত 'পানিবিদ্যুৎ' উৎপাদন ক্ষমতার সর্বোচ্চ ব্যবহার করে তার সুযোগ নিতে চায়। অপরদিকে ভুটান এবং নেপাল তাদের দেশের 'পানিবিদ্যুৎ' উৎপাদন করে কামাতে চায় হাইড্রো ডলার (ঐুফৎড় ফড়ষষধৎ)। ইতিমধ্যে এ দুই দেশের রাজস্ব আয়ের বড় অংশই এখন 'পানিবিদ্যুৎ'-এর ওপর নির্ভরশীল। এ পারস্পরিক আদান-প্রদানকে কাজে লাগিয়ে 'বিদ্যুৎ রাজনীতি' শুরু করেছে ভারত। ২০০৬ সালে ভারত ৬০ বছর মেয়াদি এক চুক্তি করেছে ভুটানের সঙ্গে। এর আওতায় ২০২০ সালের মধ্যে ভুটান থেকে ন্যূনতম ৫ হাজার মেগাওয়াট বিদ্যুৎ আমদানি করবে ভারত।

ভুটান এ সক্ষমতাকে বাড়িয়ে দ্রুতই তা ১০ হাজার মেগাওয়াটে রূপান্তরিত করতে চায়। নেপালও এ সম্ভাবনাকে কাজে লাগিয়ে ২২ হাজার মেগাওয়াট পানিবিদ্যুৎ উৎপাদনের মহাপরিকল্পনা হাতে নিয়েছে, যার পুরোটাই রফতানি হবে ভারতে।

এ সংক্রান্ত একাধিক আন্তর্জাতিক সমীক্ষা পর্যালোচনা করে জানা গেছে, হিমালয় পর্বতশ্রেণী থেকে উৎপাদিত নদীগুলোকে ব্যবহার করে কমপক্ষে ২ লাখ ২৭ হাজার ৬৯২ মেগাওয়াট পানিবিদ্যুৎ উৎপাদিত হতে পারে। এর মধ্যে বিচ্ছিন্ন বাঁধ দিয়ে এখন পর্যন্ত উৎপাদন করা সম্ভব হয়েছে মাত্র ৩৪ হাজার ৮৬৯ মেগাওয়াট। অর্থাৎ হিমালয় পর্বতশ্রেণীবাহিত নদীগুলোর ওপর ড্যাম নির্মাণ করে ভুটান, নেপাল, পাকিস্তান, ভারত যে 'পানিবিদ্যুৎ' তৈরি করতে পারে তার মাত্র ১৫ দশমিক ৩ শতাংশ এখন উৎপাদিত হচ্ছে।

এ হিমালয় পর্বতশ্রেণী থেকে উৎপন্ন হওয়া নদীগুলোর ওপর বাঁধ নির্মাণ করে পানিবিদ্যুৎ উৎপাদনের এ সম্ভাবনাকেই এখন কাজে লাগাতে চাইছে ভারত। একাধিক গবেষণাপত্রের হিসাব অনুযায়ী নেপাল, ভুটান, পাকিস্তান, ভারত এ চার দেশে ১০০টি পানিবিদ্যুৎ প্রকল্পের কাজ চলছে, যেখানে বিদ্যুৎ উৎপাদন হবে ২৩ হাজার ৬১৮ মেগাওয়াট। নির্মাণাধীন আছে ৪৬টি প্রকল্প, যার বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা ১৯ হাজার ২৫৪ মেগাওয়াট। পরিকল্পনাধীন আছে ৪০৬টি প্রকল্প, যার উৎপাদন ক্ষমতা ১ লাখ ৬৯ হাজার ৪০১ মেগাওয়াট অর্থাৎ উজানে থাকা নদীগুলোর ওপর বাঁধ নির্মিত হচ্ছে ৫৫২টি। বিদ্যুৎ উৎপাদিত হবে ২ লাখ ১২ হাজার ২৭৩ মেগাওয়াট।

বিশেষজ্ঞরা যা বললেন : প্রখ্যাত পানি বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক আইনুন নিশাত হিমালয়কেন্দ্রিক বাঁধ নির্মাণ প্রসঙ্গে জানান, ১৯৯৭ সালে প্রণীত পানি সম্পর্কিত আন্তর্জাতিক কনভেনশনে বাংলাদেশ এখনও অনুস্বাক্ষর করেনি। অনুস্বাক্ষরের বিষয়টি এখন বিবেচনার দাবি রাখে। সরকারের উচিত এসব বিষয়ে সঠিক তথ্য-উপাত্ত বিশেষণ ও গবেষণা করা। এরপর এর ভিত্তিতে আন্তঃসরকারের আলোচনা করে পরিবেশসম্মত সিদ্ধান্ত নেয়া দরকার। আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন এ বিশেষজ্ঞ বলেন, বাংলাদেশের মতো ভারতেও পরিবেশ সচেতনতা রয়েছে। তবে কি ভারত পরিবেশ সমীক্ষা না চালিয়েই এগুলো করছে? বিষয়টিকে এমনভাবে দেখা যায়, ভারত তার দেশের সীমানার মধ্যে সীমাক্ষা চালায়, সেখানে কি প্রভাব পড়বে তা নিয়ে মতামত দিয়ে থাকে। যখন সরকারি পর্যায়ে আলোচনা হবে, তখন এ বিষয়টি তুলে ধরা উচিত। এসব প্রকল্প বাস্তবায়নে বাংলাদেশে কোন কোন ক্ষেত্রে কতটুকু বিরূপ প্রভাব পড়ছে তা বিশেষণ সহকারে উপস্থাপন করা।

বিশিষ্ট জলবায়ু বিশেষজ্ঞ আতিক রহমান বলেন, উজানে বাঁধ দিলে ভাটিতে অবশ্যই প্রভাব পড়বে। তবে এসব বাঁধে কি কি ধরনের বিরূপ প্রভাব পড়বে তা নিয়ে সমীক্ষা চালাতে হবে। এখন এসব বিষয়ে বিচ্ছিন্ন তথ্য-উপাত্ত আসছে। আন্তঃসরকার পদক্ষেপ নিয়ে পরিবেশ, জলবায়ু, জীববৈচিত্র্য প্রভৃতি বিষয়কে প্রাধান্য দিয়ে সমন্বিত সমীক্ষা প্রয়োজন। আতিক রহমান মনে করেন, এসব বিষয়ে এখনই সরকারকে সতর্ক হওয়া প্রয়োজন। আর সীমাক্ষা যেন নদীর অববাহিকাকেন্দ্রিক হয়। তিনি বলেন, এখন থেকেই এসব বিষয়ে কারিগরি কমিটি সভা করতে পারে, পর্যালোচনামূলক পদক্ষেপ নিতে পারে। তিনি বলেন, জনউদ্যোগের পাশাপাশি অবশ্যই এসব ব্যাপারে সরকারি উদ্যোগ থাকতে হবে।

পরিবেশ বাঁচাও আন্দোলনের চেয়ারম্যান নাসের খান বলেন, এ ধরনের পরিকল্পনা গ্রহণের আগে অবশ্যই ভাটি অঞ্চলের দেশের সঙ্গে কথা বলা উচিত। নদীর স্বাভাবিক প্রবাহ রোধ করা হলে প্রকৃতি বিরূপ হয়ে ওঠে। বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য বড় বড় বাঁধ নির্মাণ করার সময় থেকে পানিপ্রবাহ নিয়ন্ত্রণ করা হয়। এর ফলে বর্ষা মৌসুমে পানি ছেড়ে যেমন আমাদের ভাসিয়ে ফেলবে, তেমনি খরার সময় পানি পাওয়া যাবে না, যা আমাদের জীববৈচিত্র্য, কৃষি, সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করবে। পানি নিয়ে তখন নানা ধরনের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক সমীকরণ তৈরি হবে। যার বিরূপতায় জনজীবনে দেখা দেবে বিপর্যয়। পরিবেশবাদী নাসের খান মনে করেন, এ ধরনের উদ্যোগ গ্রহণের সময় পানি ব্যবস্থাপনা বিষয়ক আন্তর্জাতিক নীতিমালা অনুসরণ করা প্রয়োজন।

টিপাইমুখ বাঁধ প্রতিরোধ কমিটির সমন্বয়কারী প্রকৌশলী মুহম্মদ হিলালউদ্দিন বলেন, যত উজানে ড্যাম তৈরি

হবে, ততই নিচে পলি আসা বন্ধ হবে। আর হিমালয়ের পাদদেশে ড্যাম তৈরি হলে ইকোলজিক্যালি ব্রহ্মপুত্র মারা যাবে। এ ধরনের ড্যাম তৈরির মানে হচ্ছে, প্রকৃতির ওপর বিশাল হস্তক্ষেপ, যা বড় ধরনের অপরিণামদর্শী সিদ্ধান্তও বটে। গত কয়েক শতক ধরে শিল্প বিকাশের জন্য প্রকৃতির ওপর যথেচ্ছাচার করা হচ্ছে। এর ফলে ইতিমধ্যেই জলবায়ু বিপর্যয় শুরু হয়েছে।

http://www.jugantor.info/enews/issue/2010/11/10/news0072.php